এটি সভ্যতার সংঘাত নয়
ক্রুসেড যুদ্ধ!

বাত্তার খুরাসানী

মুহিব্বুল্লাহ নুমান অনূদিত

এটি সভ্যতার সংঘাত নয়;

ক্রুসেড যুদ্ধ!

মূল:

বাত্তার খুরাসানী

অনুবাদ:

মুহিব্বুল্লাহ নুমান

****

সূচনা

আমেরিকান ম্যাগাজিন ফরেন অ্যাফেয়ার্স ১৯৯৩ সনে *'সভ্যতার সংঘাত'* নামে স্যামুয়েল হান্টিংটনের একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে, যা পরবর্তীতে স্বতন্ত্র বই আকারে প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধটিতে ভবিষ্যতে কুফফারদের পক্ষ থেকে মুসলিমদের উপর ঘটিতব্য ভবিষ্যৎ আগ্রাসনগুলোর ব্যাপারে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়া হয়েছিল। বিশেষভাবে সেই প্রবন্ধের এক জায়গায় সুস্পষ্টভাবে এ কথা লেখা ছিল যে, **"পশ্চিমা সভ্যতার সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হলো ইসলাম।"** উক্ত লেখায় প্রবন্ধকার এই দাবিও করেছিল যে, ভবিষ্যতে যুদ্ধসমূহ সংগঠিত হবে সভ্যতা কেন্দ্রিক বুনিয়াদের উপর। এ প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর গুরুত্ব এজন্যও আরো বেশি বৃদ্ধি পায় যে, স্যামুয়েল হান্টিংটন কোনো সাধারণ ব্যক্তি নন, বরং তিনি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসর এবং মার্কিন নীতিনির্ধারকদের নিকট রয়েছে তার বিশেষ মর্যাদা।

এদিকে ঠিক যেই মুহূর্তে পশ্চিমের বড় বড় সুতীক্ষ্ম মেধাগুলো তাদের সভ্যতা ও ইসলামের মধ্যকার আসন্ন একতরফা যুদ্ধের ছক তৈরি করতে ব্যস্ত, দুর্ভাগ্যবশত: আমাদের বুদ্ধিজীবি ও চিন্তাবিদরা তখন তাদের পরিকল্পনাগুলোর খবর পেয়েও তাকে নিছক কল্পনা বলে ধরে নিল। বরং সে সময় তাদেরকে কথিত আন্তঃধর্মীয় সংলাপের আহ্বান জানাতে দেখা গেল। এসব ব্যক্তিবর্গের নিকট 'সভ্যতার সংঘাত' কথাটাই অনর্থক মনে হয়। কারণ, তাদের মতে সভ্যতাসমূহের মাঝে আবার সংঘাত কিসের? বরং সংঘাত ও সংঘর্ষ তো হলো অসভ্যতার অংশ। অসভ্যরা অসভ্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

মজার বিষয় হলো, কিছু দ্বীনি আন্দোলনের পক্ষ থেকে এই আওয়াজ উঠতে দেখা যাচ্ছে যে, সভ্যতাসমূহের মাঝে পারস্পরিক সংলাপ ও অসাম্প্রদায়িক সহাবস্থান নিশ্চিত করা জরুরী। এ লক্ষ্যে তথাকথিত কিছু বুদ্ধিজীবি এই মতবাদ ও চিন্তার প্রসার করতে করতে সজ্ঞানে ও অজ্ঞানে দ্বীনের অনেক মৌলিক আকিদারও পরিবর্তন করে ফেলেছে। সাম্প্রতিক সময়ে আমরা 'আন্তঃধর্মীয় সংলাপ' 'উদার দৃষ্টিভঙ্গি' 'অসাম্প্রদায়িক নিরাপদ সহাবস্থান' 'আমাদের মাসীহি ভাই' 'তিন ধর্মের ভিত্তিতে মিল্লাতে ইবরাহীম' ইত্যাদি নানা ধরনের পরিভাষার ব্যাপক শোরগোল শুনতে পাচ্ছি।

একদিকে যখন আমাদের বুদ্ধিজীবিশ্রেণী এ জাতীয় উদ্ভট ও দ্বীনবিরোধী চিন্তা-চেতনা প্রচার-প্রসারে মশগুল, অন্যদিকে তখন আমাদের শত্রুরা সভ্যতার সংঘাত শব্দটিকে তার পূর্ণাঙ্গ অর্থে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। একানব্বইয়ের উপসাগরীয় যুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী ইরাকের উপর অর্থনৈতিক অবরোধের মাধ্যমে দশ লক্ষ নিষ্পাপ শিশু ও আরো কয়েক লাখ বনি আদমের হত্যাকাণ্ড আমাদের চোখ খুলে দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল। এটা সুস্পষ্ট যে, কুয়েতের তথাকথিত স্বাধীনতা একটি অজুহাত ছিল মাত্র, আসল উদ্দেশ্য তো এই ছিল যে, ইসলামী ভূমির অন্তর সমতুল্য জায়গায় একটি শক্তিশালী কুফরি ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করা।

সত্য কথা হলো, দূরদর্শী ব্যক্তিবর্গ নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার সামনে আসার পরই বলে দিয়েছিলেন যে, এটি একটি নতুন ও সর্বব্যাপী ক্রুসেডের সূচনা।

পশ্চিমা নেতৃত্ব এই যুদ্ধকে ক্রুসেড হিসেবেই লড়ে যাচ্ছে!

১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ এর পরবর্তী পরিস্থিতি এবং আফগানিস্তান ও ইরাকের উপর মার্কিন আধিপত্যবাদী আগ্রাসন ছিল এই ক্রুসেড যুদ্ধের ধারাবাহিকতা। যারা এ সকল ক্রুসেডীয় আগ্রাসনকে মুজাহিদীনদের কর্মকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখাতে চান, তাদের নির্বুদ্ধিতা ও অবিবেচনাবোধ দূর করার জন্য একজন বিশ্লেষকের এতটুকু মন্তব্যই যথেষ্ট হবে আশা করি।

‘‘আত্মোপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত ও অসুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী বোকার হদ্দরা একথা ভেবে বসে আছে যে, ১১ সেপ্টেম্বরে আমরা আমেরিকার বাণিজ্যিক ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক স্থাপনায় আঘাত হেনেছি বলেই আমাদের প্রতি আমেরিকার এই আক্রোশ, অসন্তোষ ও আগ্রাসন। নতুবা পশ্চিমাদের কি এমন প্রয়োজন ছিল আমাদের উপর আগ্রাসন পরিচালনা করার? এসব লোকদের জ্ঞানের দীনতা ও মেধার স্বল্পতা শুধু পরিতাপের বিষয়ই নয় বরং লজ্জাজনক!

তাদের নিকট প্রশ্ন যে, আমাদের মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর কি লন্ডনের উপর কোনো আক্রমণ করেছিলেন? যার ফলে ব্রিটেন আমাদের পুরো উপমহাদেশের উপর আগ্রাসন পরিচালনা করে আমাদের স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে নিয়েছিল?

আলজেরিয়ার মুসলমানরা কি প্যারিসকে লন্ডভন্ড করে দিয়েছিল, যার শাস্তিস্বরূপ ফ্রান্স আলজেরিয়া দখল করে নিয়েছিল? কিংবা অন্যান্য মুসলমানরা কি জার্মানি, হল্যান্ড, পর্তুগাল, ইত্যাদি উপনিবেশবাদী দেশগুলোর বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, যার ফলশ্রুতিতে তারা পুরো মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল?

এ প্রশ্নগুলোর উত্তর হলো, ‘না’।

আসলে পশ্চিমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বভাব এতটাই নীচু ও অনৈতিক যে, তারা নিজেদের কোন স্বেচ্ছাচারী কাজের ক্ষেত্রে কোন ধরনের নৈতিকতা, বৈধতা ও দায়বদ্ধতার মুখাপেক্ষী নয়।”

মুসলিমদের বিরুদ্ধে শতাব্দীব্যাপী ক্রুসেডীয় ঘৃণা ও জিঘাংসার চাষাবাদ, আফগান ও ইরাকের সাধারণ জনবসতির উপর ‘টমাহক’ ও ‘ডেইজি কাটার’ বোম এর মতো অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের ব্যবহার— এ সবের মধ্যে কোন অনৈতিকতা দেখতে পায় না আমেরিকা। কোন ধরনের অপরাধবোধ জাগ্রত হয় না ওদের ভেতর।

আফগান ও ইরাকের ভূমিতে কাঠের পুতুলের মত কিছু মুরতাদ শাসককে বসিয়ে রাখার কী উদ্দেশ্য তাদের? এ প্রশ্নের উত্তর যদি আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট ‘বুশ’ এর মুখে শুনতে চান, তাহলে শুনুন— **‘‘এটি একটি ক্রুসেড।”**

আমেরিকার এই শয়তান ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালের এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা ঘোষণা করে যে,

This crushed, This war on terror is going to take a while
“এই ক্রুসেড বা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে।”

অনুরূপভাবে আমেরিকান ম্যাগাজিন ন্যাশনাল রিও ইয়োর এক রিপোর্টে বলা হয়, "এই হামলার পরিকল্পনাকারীরাই যে শুধু অপরাধী তা নয়, বরং নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে হামলার সংবাদ শুনে যে চেহারাগুলো হাস্যোজ্জ্বল হয়েছিল তারা সকলেই অপরাধী। আমরা তাদের দেশে হামলা করে তাদের নেতৃত্বকে ধ্বংস করব। আমেরিকার ফেরাউন পাপিষ্ঠ বুশ 'ক্রুসেড' শব্দটি আফগান আক্রমণের কিছু পূর্বেই তার নাপাক মুখে উচ্চারণ করেছিল। উচিত তো ছিল, বুশের অপবিত্র মুখ থেকে এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই গাফলতির ঘুম ভেঙে সজাগ হয়ে যাওয়া।

কিন্তু কবির ভাষায়—

آے "بسا آرزو کہ خاک شدہ

"হায়! লালিত সব স্বপ্ন-ই যে মাটি হয়ে গেল"

অধিকাংশ মুসলিমরা এই সংকটাপন্ন মুহূর্তেও গাফলতের চাদরখানি ছুঁড়ে ফেলতে পারল না। এদিকে মুনাফিকের দল তখন আমেরিকার এই আগ্রাসনকে একটি কাকতালীয় ঘটনা বলে এড়িয়ে গেল। অথচ মনোবিজ্ঞানীদের মতে, মানুষ সাধারণ অবস্থায় থাকাকালীন সময়েও তার থেকে এমন কোনো কথা বা কাজ প্রকাশ পায় না, যা আকস্মিক ও কাকতালীয়। বরং তার পেছনে কোন না কোন মনস্তাত্ত্বিক কারণ থাকে। প্রেসিডেন্ট বুশের উক্ত বক্তব্য ও পরবর্তী কার্যকলাপের পেছনের মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলোও ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। যেমন আল্লাহর বাণী—

قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ

"শত্রুতাপ্রসুত বিদ্বেষ তাদের মুখ ফুটেই বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য।"*[সূরা আলে ইমরান : ১১৮]*

জর্জ বুশের সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল এস ক্রাফট ইসলাম ও খ্রিস্টবাদে স্রষ্টার ধারণা সংক্রান্ত বিষয়ে তুলনা করতে গিয়ে খ্রিস্টবাদের স্রষ্টার ধারণাকে ইসলামের স্রষ্টার ধারণার চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন। তার পূর্বে ইতালির প্রধানমন্ত্রী বলেছিল, **"পশ্চিমা সভ্যতা ইসলামী সভ্যতার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর।"** আর এই পশ্চিমা সভ্যতা যেভাবে কমিউনিজমকে পরাস্থ করেছে, সেভাবেই ইসলামকেও পরাজিত করবে।

অন্য আরেক সময় প্রেসিডেন্ট বুশ ক্যানাডিয়ান একটি সেনা সমাবেশে নিম্নোক্ত বাক্যটি পুনরাবৃত্তি সহকারে বলে এ কথা প্রমাণ করে দেবার চেষ্টা করে যে, তারা যা বলে তা অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করে। সে বলেছিল— **"আসুন, আমাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই ক্রুসেডে শামিল হোন।"** কথাটি সে একাধিকবার বলে।

এ কথার উপর ভিত্তি করে রবার্ট ফস্ক তার এক প্রবন্ধের মধ্যে লিখেন, ''মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট বুশ নিজেকে ক্রুসেডের এক মহান সেনাপতি হিসেবে কল্পনা করছেন। একবার বলার পরও দ্বিতীয়বার ক্রুসেড শব্দটি পুনরাবৃত্তি করার দ্বারা এটাই বোঝা যায়।'' পশ্চিমা নেতৃবৃন্দের এ সব বক্তব্য থেকেই তাদের আবেগ অনুভূতি ও চিন্তা-চেতনার মাত্রা ফুটে ওঠে।

বাস্তবিক পক্ষে ইসলামী বিশ্বের উপর আগ্রাসন বিস্তার করা এই নব্য ক্রুসেডের শিকড় অনেক গভীরে প্রোথিত। গত অর্ধশতাব্দী যাবত কাফেরদের হাতের পুতুল মুরতাদ শাসকগোষ্ঠীর মাধ্যমে নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণের পর এখন নতুন করে ওরা সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের পায়তারা শুরু করেছে। ক্রুসেডাররা আমাদের জল-স্থল ও আকাশসীমা স্বাধীনভাবে ব্যবহার করছে। এমনকি ইসলামী বিশ্বের অন্তর সমতুল্য আরব উপদ্বীপে ওরা নিজেদের আস্তানা গেড়ে বসেছে। যেন অনতিবিলম্বে বৃহত্তর ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এছাড়া এই

সর্বব্যাপী আগ্রাসন শুধু যে সামরিক তাও নয়, বরং একই সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিকও বটে।

বাগরাম-গুয়ান্তানামোতে নিয়মিত কুরআনের অসম্মান, আবু গারিব কারাগারে মুসলিম বন্দীদের হেনস্থা ও শ্লীলতাহানি, বিভিন্ন পশ্চিমা মিডিয়ায় রিসালাতে নববীকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে স্কেচ আঁকা ও রম্যরচনা প্রকাশ, ভ্যাটিকানের পোপ ও খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র চরিত্র নিয়ে অশালীন ও অশ্রাব্য মন্তব্য—, এ সমস্ত বিষয় দিবালোকের ন্যায় স্পষ্টভাবে এ কথা প্রমাণ করে দেয় যে, কথিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে ওরা মূলত: ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। এই যুদ্ধের মাধ্যমে উম্মাহর সভ্যতা-সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের পরিচয়কে বিকৃত করা, ইসলামী রেনেসাঁর আন্দোলনসমূহকে নিশ্চিহ্ন করা এবং মুসলমানদের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ ও উপকরণসমূহকে লুণ্ঠন করাই তাদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

ক্রুসেডসমূহের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা

ইতিহাস অধ্যয়ন মানবীয় উপলব্ধি গঠন প্রক্রিয়ায় অনেক বড় ভূমিকা রাখে। এ অধ্যয়ন যদি নিরেট জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তির সাথে সাথে সমকালীন প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে হয়, তাহলে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে থাকা অনেক উপকারী শিক্ষা এবং সমকালীন ঘটনাবলীর পেছনের কারণ ও কার্যকারণগুলো খুব সহজেই বোঝা যায়।

পবিত্র কুরআন বারবার ঐতিহাসিক ঘটনাবলী উল্লেখ করে তার মাঝে চিন্তা ফিকির করতে বলেছে। কিন্তু আফসোসের বিষয় হল: সমকালীন মুসলিমদের মধ্যে অনেক কম মানুষই ঐতিহাসিক অন্তরদৃষ্টির মাধ্যমে সৌভাগ্যবান হয়েছেন।

যারা ইতিহাসের ছাত্র হবার দাবী করেন, তাদের অধিকাংশের অবস্থাও এই যে, তারা নিজ জাতির ইতিহাসের চেয়ে পশ্চিমাদের ইতিহাস বেশি অধ্যয়ন করেন। আবার এদের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য শ্রেণি নিজেদের ইতিহাস জানতে পশ্চিমা ঐতিহাসিকদের দ্বারস্থ হয়, ফলে ইতিহাসের ঘটনাবলীকে তারা পশ্চিমাদের চোখ দিয়ে দেখতে থাকে।

ফ্রান্স থেকে হিত্তিন

হিজরী প্রথম শতাব্দীতে মুসলিম মুজাহিদদের হাতে শাম ও উত্তর আফ্রিকার বিজয় খ্রিস্টানদের অন্তরে ব্যাপক হিংসা ও জ্বালাপোড়ার সৃষ্টি করেছিল। এই ইসলাম বিদ্বেষের পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল গির্জাগুলোর। কারণ -

প্রথমত, গির্জাগুলোর লাভ-ক্ষতি খ্রিস্টান সামন্ত ও রাজা-বাদশাহদের লাভ ক্ষতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল।

দ্বিতীয়ত, সাধারণ খ্রিস্টানদের মনোজগতে গির্জার উদ্ভট কুসংস্কার ও বানোয়াট আচার-অনুষ্ঠানের গণ্ডি থেকে স্বাধীনতা অর্জনের যে মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল, ইসলামী বিজয়গুলো তার পেছনে বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছিল। এটিই ছিল ইসলামের প্রতি গির্জার ব্যাপক ক্ষোভ, ঘৃণা ও হিংসার কারণ। ফলশ্রুতিতে একপর্যায়ে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে এমন বিষাক্ত প্রোপাগান্ডার ব্যাপক প্রচার-প্রসার শুরু করলো, যার ফলে সাধারণ খ্রিস্টানদের অন্তরে ইসলামের প্রতি সীমাহীন ঘৃণা, বিদ্বেষ ও জিঘাংসা উপচে পড়তে লাগলো।

৪৭৯ হিজরী মোতাবেক ১০৯০ খ্রিস্টাব্দে পোপ দ্বিতীয় আরবান ফ্রান্সে পাদ্রীদের এক বিশাল সমাবেশে বক্তব্য

দিতে গিয়ে বলেছিল— **''ইসলাম একটি শয়তানী ধর্ম। ইসলামের অনুসারীরা একটি শয়তানী ধর্মের অনুসারী। এজন্য আমাদের উচিত, এই শয়তানি ধর্ম আর এর অনুসারীদের এই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া।''** এরপর সে পুরো ইউরোপকে এক পতাকা তলে একত্রিত হয়ে বাইতুল মাকদিস উদ্ধারের লক্ষ্যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার আহ্বান জানাতে থাকে।

তার এই আহ্বানের ফলে মাত্র তিন বছরের মধ্যে পুরো ইউরোপ ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় এবং মুসলিম ভূখণ্ডে আক্রমণ করে বসে। শামের সালজুক সালতানাতের সৈন্যরা সর্বপ্রথম অগ্রগামী হয়ে এই বর্বর আক্রমণ রুখে দেয়। ফলে তাদের প্রথম প্রচেষ্টা সম্পূর্নরূপে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কয়েক বছর পর ক্রুসেডাররা আগের তুলনায় আরো বেশি যুদ্ধোপকরণে সমৃদ্ধ, সুসংহত এবং সুসংবদ্ধভাবে আক্রমণ পরিচালনা করে। এবার কিছুটা সফলতা ওদের হাতে আসে। ৪৯১ হিজরীতে ওরা এন্টিওক প্রবেশ করে। সেখান থেকে সহজেই বাইতুল মাকদিস অভিমুখে যাত্রার পথ খুঁজে পায় এবং ওখানে পৌঁছেও যায়। বাইতুল মাকদিস পদানত হয়। এরপর ৪৯৪ হিজরীতে হাইফা, ৪৯৭ হিজরীতে আক্কা, ৫০৩ হিজরীতে তারাবলুস, ৫০৪ হিজরীতে সাইদা, একের পর এক ক্রুসেড বাহিনীর অধিকারে চলে যেতে লাগল।

ক্রুসেডারদের এই সফলতার পেছনে পর্দার অন্তরালে কাজ করেছিল মিশরের মুরতাদ ফাতেমী শাসকগোষ্ঠী। তারা সুন্নি সালজুক সালতানাতের বিরুদ্ধে ক্রুসেডার খ্রিস্টানদের এই শর্তে সাহায্য করছিল যে, ওদের হাতে সাম্রাজ্যের পতনের পর শামের কিছু অংশ ফাতেমী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হবে।

এরপর তৃতীয়বারের মতো ক্রুসেডার যোদ্ধারা মুসলিম ভূখণ্ডে আক্রমণ পরিচালনা করে, যেন মুসলিমদের ভূমিতে ঘাঁটি গেড়ে বসা ক্রুসেডারদের আধিপত্য আরো সুদৃঢ় ও ও শক্তিশালী হয়ে যায়। কিন্তু এইবার মুসলিমদের বিভিন্ন জিহাদী জামাত এবং জাংকি সাম্রাজ্যের মুজাহিদরা অগ্রসর হয়ে ক্রুসেডার হায়েনাদের যথোচিত মোকাবেলা শুরু করে। মুসলিম ও ক্রুসেডারদের এই মুখোমুখি যুদ্ধে কখনো এক দলের পাল্লা ভারী হতে থাকে তো কখনো অপর দলের পাল্লা ভারী হয়ে যায়। এভাবে ৫৮৩ হিজরীতে এসে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী হিত্তিনের ঐতিহাসিক রণাঙ্গনে চূড়ান্তভাবে ক্রুসেডারদের কোমর ভেঙে দেন। লক্ষণীয় বিষয় হলো, ইতিহাসের মোড় পরিবর্তনকারী এই যুদ্ধে বিজয় ও সফলতা লাভের অন্যতম কারণ ছিল, এই যুদ্ধের আগেই সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী 'ঘরের শত্রু বিভিষণ' ফাতেমী সালতানাতের শিকড় উপড়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এদিকে ক্রুসেডের উন্মাদ নেতৃবৃন্দের যুদ্ধের এতই খায়েশ ও নেশা ধরে গিয়েছিল যে, হিত্তিনের উপত্যকায় প্রচন্ড মার খাবার পরও তারা ছোট, বড় আক্রমণ পরিচালনা অব্যাহত রাখল। সাথে সাথে মুসলিমদের নিয়মিত ও অনিয়মিত বিভিন্ন সেনা দলের পক্ষ থেকেও সে সবের শক্ত প্রতিরোধ ও জবাব তারা পেতে থাকলো। এই ধারাবাহিকতার শেষের দিকে কোন এক যুদ্ধে সুলতান রুকনুদ্দীন বাইবার্স এর হাতে ফরাসি সম্রাট নবম লুই কয়েক হাজার সৈন্য সমেত গ্রেফতার হলো। এরপর আর ক্রুসেডাররা এদিকে দৃষ্টি উঠাবার সাহস দেখায় নি।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ক্রুসেড

এই শোচনীয় পরাজয়ের পর ক্রুসেডাররা ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের চলমান যুদ্ধের কর্মপদ্ধতি ও কলাকৌশলে কিছু মৌলিক পরিবর্তন আনে। প্রায় ছয় শতাব্দী পর নতুন পৃথিবী ও নতুন সামুদ্রিক বাণিজ্যের পথ অনুসন্ধানের অজুহাতে ইসলামী বিশ্বের চারপাশের সীমানাকে সংকীর্ণ করে দেয়া হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে

প্রসিদ্ধ ভাস্কো-দা-গামার ঐতিহাসিক ভারত সফর। সেই সফরের সফল পরিসমাপ্তির পর ঘোষণা করা হয়েছিল যে, **“আমরা ইসলামী দুনিয়ার গর্দানে রশি পরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছি, এখন শুধু এই রশি ধরে টানবার বাকি।”** পরবর্তীতে তাই হয়েছিল।

ওই যুগ, যাকে সাম্রাজ্যবাদী ক্রুসেডাররা ঔপনিবেশিক যুগ বলে আখ্যায়িত করে থাকে, মূলত: সেটাও ছিল সেই চলমান ক্রুসেডের একটি ধারাবাহিকতা মাত্র। আঠারো শতকে ইউরোপের অসভ্য জাতিগুলো সভ্যতার ছদ্মবেশ ধারণ করে নিজেদের ভূখণ্ড থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং দেখতে দেখতেই নিজেদের শক্তিমত্তার পাশবিক ব্যবহার করে এবং ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে প্রায় পুরো ইসলামী দুনিয়াকে ওরা নিজেদের কব্জায় নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। বিংশ শতকের ইসলামী মানচিত্রের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আলজেরিয়ার উপর ফরাসি ক্রুসেডারদের আধিপত্য ও জয়জয়কার। ভারতীয় উপমহাদেশ ও উপসাগরীয় অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক জালে আবদ্ধ। লিবিয়ার উপর ইতালির কব্জা। মালয়েশিয়ার উপর ওলন্দাজ আধিপত্য। অন্যদিকে মধ্য এশিয়ার ট্রান্স অক্সিয়ানা অঞ্চলগুলো অর্থডক্স ক্রুসেডারদের হাতের মুঠোয়।

এই সম্রাজ্যবাদী যুগের আধিপত্যবাদী কর্মকাণ্ডের পেছনে শুধু শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রেক্ষাপটই ক্রিয়াশীল ছিল না, বরং এর অন্তরালে ক্রুসেডারদের ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা ও সভ্যতা-সংস্কৃতি বিস্তারের লক্ষ্য পুরোদস্তুর সক্রিয় ছিল। এজন্যই দেখা যায় ইসলামী হিন্দুস্তানের উপর ক্রুসেডারদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আওয়াজ উঠেছিল যে, **“ঈশ্বর আমাদেরকে হিন্দুস্তানে যীশুখ্রিস্টের ধর্ম প্রচারের সুযোগ করে দিয়েছেন।”**

এছাড়া এই আগ্রাসনগুলোর পেছনে গির্জার নেতৃবৃন্দের নিরঙ্কুশ সমর্থন ও সীমাহীন সহযোগিতা কার্যকর ছিল। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলো পাদ্রী নিকোলাই পঞ্চম, যে এই যুদ্ধগুলোকে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পরিচালিত করতে পরিপূর্ণভাবে নিমগ্ন ছিলো। শামের পবিত্র ভূমি কব্জা করার পর এক খ্রিস্টান জেনারেল অ্যালেনবি সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর কবরের উপর তরবারির আঘাত করে বলেছিল— **“দেখো সালাহউদ্দিন, আমরা আবার এসে গেছি।”**

ঔপনিবেশিক যুগে ক্রুশের পূজারীরা সামরিক আগ্রাসনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ময়দানেও ব্যাপক মেহনত করে। ‘প্রাচ্যবিদ’ নামক এক নতুন দলের আবির্ভাব ঘটে, যারা ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের সূক্ষ্ম আগ্রাসনকে জ্ঞানতাত্ত্বিক মোড়কে উপস্থাপন করে। ওরা ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতিকে ‘সেকেলে’ ও ‘আধুনিক’— এই দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলে। এভাবেই এই প্রথমবারের মতো ক্রুসেডারদের জন্য ইসলামী দুনিয়ার এমন লক্ষাধিক গোলাম তৈরি হয়ে যায়, যারা দালিলিকভাবে গোলামী ও পরাজয় নিয়ে কেবল সন্তুষ্টই না, বরং আনন্দিতও বটে।

(উপমহাদেশে এই স্তরের গোলামদের মধ্যে সর্দার পর্যায়ের হলো: স্যার সৈয়দ আহমদ খান, যে ইংরেজদের বলপূর্বক ও জবরদস্তিমূলক শাসনকে আল্লাহর অনেক বড় রহমত হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিল। সে মুজাহিদীনকে গালিগালাজ করে বেড়াতো এবং আমাদের আকাবিরদের অসম্মান ও লাঞ্ছিত করার কোন পন্থাই হাতছাড়া করত না।)

একবিংশ শতাব্দীর ক্রুসেড: একটি সর্বব্যাপী যুদ্ধ

১৯৯১ এ কুয়েতের উপর থেকে ইরাকের দখলদারিত্ব ছাড়াবার অজুহাতে আমেরিকার ইরাক আগ্রাসন নিঃসন্দেহে সমকালীন ক্রুসেড যুদ্ধের টার্নিং পয়েন্ট ছিল। পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, এগারো-বারো শতকের ক্রুসেডারদের পুরো চিন্তা-চেতনা জুড়ে ছিল খৃষ্টবাদের উন্মাদনা, আর সমকালীন ক্রুসেডারদের অর্ধেক খ্রিস্টবাদী চিন্তা-চেতনা দ্বারা প্রভাবিত আর বাকি অর্ধেক সেক্যুলার। তাছাড়া বর্তমানের 'খ্রিস্টবাদ' পুঁজিবাদী সেক্যুলারিজমের চিন্তাধারার মাঝে একাকার হয়ে গেছে।

উপসাগরীয় যুদ্ধের সময়ে মার্কিন সামরিক জোট মধ্যপ্রাচ্যের ভূখন্ডে এসে ঘাঁটি গেড়ে বসার সুযোগ পায়। এতদঞ্চলে তাদের উপস্থিতি ক্রুসেডারদের জন্য বেশ কিছু সফলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন-

প্রথমত, এটা তাদের হাতে অনেক বড় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ফায়দা এনে দেয়।

দ্বিতীয়ত, মধ্যপ্রাচ্যের ভূমিতে অবস্থানের ফলে যুদ্ধে ক্রুসেডীয় উন্মাদনা সক্রিয়ভাবে কাজে লাগানোর সুযোগ পায়, (কেননা, এই অঞ্চল মধ্যযুগীয় ক্রুসেডের স্মৃতি বিজড়িত।) যা সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়; ইরাকের মৌলিক স্থাপনা ও কাঠামোগুলো ধ্বংসকরণ, সেখানে মুসলমানদের বংশ বিস্তারে বাধা প্রদান এবং উত্তর ইরাকে খ্রিস্টবাদ প্রচার প্রসারের মধ্য দিয়ে।

এদিকে নাইন ইলেভেনের বরকতময় হামলার পর আমেরিকা কথিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে আফগানিস্তান আক্রমণের ঘোষণা দেয়। এরপর আফগানের বেসামরিক ও সাধারণ মুসলিমদের উপর সকল প্রকার রাসায়নিক ও বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ে হিংস্র আক্রমণ পরিচালনা করতে ওদের বুক সামান্যও কাঁপেনি। অতঃপর ধর্মহীন, দেশপ্রেমহীন কিছু মুরতাদকে ক্ষমতার মসনদে বসিয়ে দেয়।

এই যুদ্ধে ক্রুসেডার আমেরিকা একা নয়। বরং ইতিহাসে দ্বিতীয় বারের মতো 'আল কুফরু মিল্লাতুন ওয়াহিদাহ' এর বাস্তবতা প্রমাণিত করে সকল কুফুরি ও মুরতাদ শক্তিগুলো আমেরিকার সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে প্রথমে আফগান, এরপর ইরাকে আগ্রাসন পরিচালনা করে। অতঃপর এই আন্তর্জাতিক কুকুরদের ঐক্যবদ্ধ জোট পুরো দুনিয়ার সকল জিহাদী জামাতগুলোকে নিজেদের প্রধান টার্গেট হিসেবে স্থির করে নেয়।

ওদের লক্ষ শুধু আল-কায়েদা, তালেবান-ই নয়, বরং ফিলিপাইন থেকে নিয়ে চেচনিয়া পর্যন্ত সকল মুসলিম মুজাহিদীন তাদের টার্গেট। এটা সুস্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, শত্রুর টার্গেট নির্দিষ্ট কোন দল মত নয়, বরং উম্মাহর শিরা-উপশিরায় উদ্বেলিত রক্তের প্রবাহ ওদের প্রধান লক্ষ্যবস্তু।

কুফরি শক্তি এটাই চায় যে, মুসলিম উম্মাহ ভেড়ার পালের মত জীবন যাপন করবে। তাদের ইজ্জত সম্মান ভুলুণ্ঠিত হতে থাকবে, তাদের অঞ্চল ও ভূখণ্ডগুলো তাদের হাতছাড়া হতে থাকবে, তাদের পবিত্র স্থান, স্থাপনা ও নিদর্শনাবলীর অসম্মান করা হবে, কিন্তু তারা 'উফ্' পর্যন্ত বলবে না। এর অন্যথা হলে তাদেরকে জঙ্গী-সন্ত্রাসী ট্যাগ দিয়ে দেয়া হবে। তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়া যেন কুফরি শক্তির একটি মৌলিক অধিকার হয়ে গেছে।

ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের এই শতাব্দীব্যাপী ক্রুসেড এক নতুন দিকে বাঁক নিয়েছে। এই যুদ্ধ এতটাই সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী যে, ইসলামের কোন একটি শাখা, উপশাখা এবং তার রক্ষণাবেক্ষণকারীগণও এর নিশানা থেকে মুক্ত নয়।

একজন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির মতে, **পশ্চিমা ক্রুসেডারদের দৃষ্টি তাকেও জঙ্গী-সন্ত্রাসী হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত - যে কোন রেস্টুরেন্টে গিয়ে তাদের তৈরি পেপসির পরিবর্তে লেমনসোডা তালাশ করে।**

১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ থেকে আজ পর্যন্ত পুরো অবস্থার উপর যদি একটি পর্যবেক্ষণ ও সমীক্ষা চালানো হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে পশ্চিমাদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ বিদ্যুৎ গতিতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই রাতে যেখানে ওদের টার্গেট ছিল কেবল আমিরুল মু'মিনীন মোল্লা ওমর রহ. ও শাইখ ওসামা বিন লাদেন রহ. সেখানে আজ স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের পবিত্র সত্তা ওদের ঘৃণা ও বিদ্বেষের শিকার। আগে যেখানে শুধু মুজাহিদরাই ছিল ওদের লক্ষ্যবস্তু, এখন সেখানে প্রতিটি দ্বীনদার মুসলমান-ই ওদের টার্গেটে পরিণত হয়েছে। ৯/১১ এর পর শুধু জিহাদ-ই যেখানে ক্রুসেডারদের মাথাব্যথার একমাত্র কারণ ছিল, সেখানে আজ একজন মুসলিম রমণীর মাথায় থাকা হিজাবও তাদের সহ্য হয়না।

মোটকথা এই যে, আজ ওরা মুসলমানদের থেকে আগে বেড়ে তাদের ঈমান বিশ্বাস আর শক্তিমত্তার সূতিকাগারগুলোর উপরও আক্রমণ করতে উদ্যত।

সব মিলিয়ে এক কথায় বলা যায়- খোদ ইসলাম ও ইসলামী সভ্যতার সকল চিহ্নকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়াই এই যুদ্ধের লক্ষ্য।

সমকালীন ক্রুসেডীয় ধ্যান ধারণাকে বুঝা জরুরি!

কারো কারো জন্য এটা আশ্চর্যের বিষয় মনে হতে পারে যে, আমরা এই যুদ্ধকে 'ক্রুসেড' কেন বলছি! এদিকে মুসলিমদের মধ্য থেকে স্বল্প মেধার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ এখনো এই কাল্পনিক ধ্যান-ধারণায় ডুবে আছে যে, 'সাম্প্রতিক সমস্যাগুলো মার্কিন নেতৃবৃন্দ ও তাদের উপর চেপে বসা ইহুদী লবির পক্ষ থেকেই সংঘটিত। জর্জ বুশ একজন কাউবয় এবং রক্ষণশীল ইহুদী গোষ্ঠির অধীনস্থ একজন ইহুদী এজেন্ট ছাড়া কিছুই নয়। এই ইহুদীরা চাচ্ছে মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মধ্যে লড়াই চলতে থাকুক'। এই-ই তাদের চিন্তার দৌঁড়। আজ-কালকের পশ্চিমা প্রভাবিত লোকেরা তো মনে করে যে 'ধর্মযুদ্ধ' নামক বিষয়টির ধারণা ও কল্পনাটাই সেকেলে ও মধ্যযুগীয় চিন্তা ভাবনা। তাদের মতে সমকালীন সভ্য ও সংস্কৃতমনা পশ্চিমাদের মাঝে এই মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার ছিটেফোঁটাও নেই।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, পশ্চিমা দুনিয়া ধর্মান্ধতা ও সেক্যুলারিজম—উভয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইসলামের ব্যাপারে আগ্রাসী ও আক্রমণাত্বক। এই বিষয়টি অনেক পুরোনো। ক্যারন আর্মস্ট্রং তার 'পবিত্র যুদ্ধ' নামক বইয়ে এ কথার স্বীকারোক্তি দিয়েছেন যে, **"ক্রুসেড যুদ্ধের বিষয়টি যদিও বেশ পুরনো, কিন্তু পশ্চিমা ধ্যান-ধারণাকে তা এতটা গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে যে, সাম্প্রতিক সময়ের বিভিন্ন বড় বড় আন্তঃধর্মীয় সংঘর্ষগুলোর পেছনে এই ধ্যান-ধারণার সক্রিয় উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশেষভাবে ইসরাইল সংক্রান্ত দ্বন্দ্বকে পশ্চিমারা ক্রুসেডীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই দেখে থাকে।"**

আমাদের সমাজে এমন নির্বোধ লোকদেরও কমতি নেই, যারা প্রেসিডেন্ট বুশের মুখ থেকে ক্রুসেড শব্দের অবতারণাটিকে একটি কাকতালীয় বিষয় মনে করে এবং ভাবে যে, আমেরিকার আসল উদ্দেশ্য মুসলমানদের তেল সম্পদ। নিঃসন্দেহে এটা অজ্ঞতা ও চিন্তাগত দীনতার চূড়ান্ত স্তর। বলা বাহুল্য যে, মুসলিমদের তেল সম্পদের প্রতিও আমেরিকার লোলুপ দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে। কিন্তু আমেরিকার এই সর্বব্যাপী আগ্রাসনকে তেলের

দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা এতটা দুর্বল ও অগভীর চিন্তা ভাবনা যে, এটা সহ্য করার মতো নয়।

আসলে এসব দর্শন ও তাত্ত্বিক আলোচনার সবচেয়ে বড় ক্ষতিকর দিকটি হলো, এসবে লিপ্ত থাকতে গিয়ে উম্মাহর প্রতিরক্ষাকারী সন্তানদের জাগ্রত করতে অনেক দেরি হয়ে যায়, যেখানে কুফুরী শক্তি খুব দ্রুততার সাথে তাদের উদ্দেশ্য সফল করতে ছুটে চলছে।

এজন্য বেশি কিছু না বলে শুধু এতোটুকু বলে দেওয়া আবশ্যক মনে করি যে, এই যুদ্ধকে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ হিসেবে মানুন আর নাই মানুন, সাম্প্রতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী শরীয়াহ মতে আমাদের ওপর এই কর্তব্য অবশ্য পালনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, কাফেরগোষ্ঠির এই চতুর্মুখী আক্রমনের বিরুদ্ধে আমাদের সর্বশক্তি নিয়ে রুখে দাঁড়ানো।

যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন—

فَإِن قَٰتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَٰفِرِينَ

"অবশ্য যদি তারা নিজেরাই তোমাদের সাথে লড়াই করে। তাহলে তাদেরকে হত্যা কর। এই হল কাফেরদের শাস্তি।"*[সূরা বাকারাহ : ১৯১]*

যখন আগ্রাসীদের টার্গেট হলো ইসলাম, তখন এটাকে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ কেন বলা হবে না?

কুফফারদের বিরুদ্ধে যদি আমরা দ্বীনি স্বার্থে এবং ধর্মীয় চিন্তা চেতনার উপর ভিত্তি করে লড়াই করি, তাহলে একথা সুস্পষ্ট যে, এই যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ বলা হবে। শরয়ী পরিভাষায় যাকে বলা হয় জিহাদ। যার প্রধান উদ্দেশ্য হলো: আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের নিকট এটা কোন গুরুত্বের দাবি রাখে না যে, আমাদের শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী কিসের উপর ভিত্তি করে যুদ্ধ করছে, ধর্মীয় চিন্তা চেতনার উপর ভিত্তি করে, নাকি অন্য কোন মতবাদ যেমন জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য লড়াই করছে। এটা ভিন্ন এক প্রসঙ্গ। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো: কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া, আমাদের শরীয়তের একটি অবশ্য পালনীয় একটি বিধান।

উদাহরণস্বরূপ তাতারীদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ- জিহাদ ছিল একটি দ্বীনি যুদ্ধ, দ্বীনি লড়াই। যদিও অসভ্য ও বর্বর তাতারদের কোন ধর্ম বা সভ্যতা ছিল না। নির্দিষ্ট কোনো ধর্ম বা সভ্যতার পতাকাবাহী ওরা ছিলনা। ওদের উদ্দেশ্য ছিল কেবলই লুটতরাজ, হত্যাকাণ্ড, জ্বালাও-পোড়াও ও আগ্রাসন। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নিজেদের জান, মাল, ইজ্জত বাঁচানোটা আমাদের জন্য একটি দ্বীনি 'ফরীযা' বা ফরয দায়িত্ব ছিল। এজন্য আমরা একে ধর্মযুদ্ধ বা দ্বীনি লড়াই নাম দিতে পারি। এই হিসেবে বলা যায়, ইসলামের দৃষ্টিতে যুদ্ধ সব সময় একটি ধর্মীয় বিধান। একমাত্র দ্বীনি স্বার্থেই এটা হয়ে থাকে। ইসলামী শরীয়ত-ই এর সীমারেখা ও রূপ-প্রকৃতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। অন্যদিকে একই সাথে আমাদের শত্রুও যদি ধর্মীয় ভিত্তিতে লড়াই করে, তাহলে উভয় দল ধর্মের ভিত্তিতে লড়াই করার দিক থেকে একে নিরেট ধর্মযুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। সুতরাং এমন সকল যুদ্ধ, যা ইহুদী, খ্রিস্টান ও মূর্তিপূজকদের সাথে সংঘটিত হয়েছে, এই হিসেবে সবগুলোই ধর্মযুদ্ধ ছিল।

সাম্প্রতিক যুদ্ধসমূহের উদ্দেশ্যও এই যে, এর মাধ্যমে উম্মাহর ঈমান ও শক্তির অবস্থানগুলোকে দুর্বল করে দেয়া, যেন পুঁজিবাদী গণতন্ত্র, লিবারিজম, সেক্যুলারিজমকে উম্মাহর মাথার উপর চাপিয়ে দেয়া যায়। ইসলামও যেন খ্রিস্টবাদের মতো পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার অনুগত হয়ে জীবনযাপন করে। নিঃসন্দেহে পশ্চিমের জন্য

বন্ধুত্ববাদী কনফুসিয়ানিজম এবং সনাতনী হিন্দুত্ববাদীরা কোন বিপদের কারণ নয়, বাস্তবে তাদের জন্য যদি ভীতি ও শঙ্কার কারণ হিসেবে কোন কিছু থেকে থাকে, তবে সেটা হলো ইসলাম। কেননা, তারা খুব ভালো করেই জানে যে, ইসলাম তার অনুসারীদের কখনো পরাজিত অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকবার এবং পরাজয় মেনে নেবার শিক্ষা দেয় না। এজন্য ইসলাম ও ক্রুসেডের অনুসারীদের মাঝে এক চূড়ান্ত যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।

কিছু মানুষ ইরাক আক্রমণের ব্যাপারে পশ্চিমাদের মতানৈক্যের বিষয়টি সামনে আনতে গিয়ে একথা নির্দ্বিধায় ভুলে যায় যে, তাদের এই জাতীয় মতবিরোধ মৌলিক নয়। বেশি থেকে বেশি একে কর্মপদ্ধতি ও ব্যক্তিগত লাভ-লোকসান কেন্দ্রিক মতভেদ বলা যেতে পারে। মোটকথা যেই বিষয়টা তাদের মৌলিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত, সেখানে তারা পরিপূর্ণভাবে ঐক্যবদ্ধ।

ক্রুসেডার ইউরোপকে বসনিয়ার বিরুদ্ধে সার্বিয়ানদের পূর্ণ সহযোগিতা, আফগান আগ্রাসনে ন্যাটোজোটের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং ইরাক আগ্রাসনের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক কুফুরী নিরাপত্তা পরিষদের ঐক্যবদ্ধ রায় (যেখানে ইরাকের ওপর মার্কিন আগ্রাসনের বৈধতা দেয়া হয়েছিল)— এ বিষয়ের সুস্পষ্ট উদাহরণ।

একই অবস্থা আমেরিকার আভ্যন্তরীণ রাজনীতিবিদদেরও। রিপাবলিকান বুশ যদি ধর্মান্ধ ক্রুসেডার হয়ে থাকে, তাহলে ডেমোক্রেটিক জন কেরি ছিল সেক্যুলার ক্রুসেডার। উভয়ের-ই ইসলাম বিদ্বেষে ভরা বিভিন্ন বিবৃতি আছে। বুশ ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের বিবৃতি আমাদের সামনেই আছে যে, তারা বলেছে— **"আমরা এই যুদ্ধ ঈশ্বরের দিক-নির্দেশনায় শুরু করেছি এবং ইতিহাসই আমাদের এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাবে।"**

অন্যদিকে এই সমস্ত বিষয়কে সামনে রেখে সত্যপন্থী ও সত্যবাদী মু'মিনদের অনেকেই প্রথম সারিতে থেকে এই যুদ্ধে দুশমনের বিরুদ্ধে মোকাবেলা জারি রেখেছে। আল্লাহর পথের মুজাহিদ ও তাগুতের পথের লড়াইকারী এই দুই দলের মধ্যকার যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ না বলে আর কি বলা যায়?

১১-ই সেপ্টেম্বর পরবর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ কংগ্রেসের অধিবেশনে আটত্রিশ মিনিটের একটি বক্তব্য দেয়, যেখানে উনত্রিশবার এমন উচ্চ আওয়াজে সম্মিলিত করতালি ওঠে যে, এর জন্য প্রেসিডেন্ট কথা বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়। সেই বক্তব্যেই কথিত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করা হয়।

সেখানে তালেবানের পক্ষ থেকে বাস্তবায়িত শারঈ শাসন, কুরআনী আইনের প্রতিষ্ঠা, হিজাব বাধ্যতামূলককরণ, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি বিষয়কে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়। অথচ একজন অন্ধ ও নির্বোধও বোঝে যে, এগুলো মোল্লা ওমরের বানানো কোন আইন নয়, বরং শরীয়তে মুহাম্মদীর বিধান। সুতরাং একে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না বলে আর কী বলা যায়?

যদিও প্রেসিডেন্ট বুশ বারবার এই যুদ্ধকে ক্রুসেড হিসেবে আখ্যায়িত করেছে এবং তার অনেক সহকর্মীও ইসলামের ব্যাপারে নিজেদের ঘৃণা ও ক্ষোভকে সুস্পষ্ট শব্দে প্রকাশ করে থাকে।

তবে আমরা এতটা বোকাও নই যে, এমন কিছু রাজনৈতিক বিবৃতির উপর ভিত্তি করে এই যুদ্ধকে ক্রুসেড বলতে চাচ্ছি, বরং এই যুদ্ধ যে ক্রুসেডই, এই কথার ভিত্তি তিনটি জিনিসের উপর।

এক. এই যুদ্ধে আমাদের প্রধান প্রতিপক্ষ খ্রিস্টানরা, হাদীসসমূহে যাদেরকে রোমক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

দুই. এই যুদ্ধের পেছনে সক্রিয় ভূমিকা রাখা মৌলিক বিষয়সমূহের মধ্যে তাদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিও শামিল।

তিন. পৃথিবীব্যাপী এই যুদ্ধে তাদের একমাত্র লক্ষ্য ইসলাম, মুসলমান, মুসলমানদের জিহাদী আন্দোলনসমূহ এবং শরীয়াহ প্রতিষ্ঠাকারী ইসলামী হুকুমতসমূহ। যেমন আফগানিস্তান, সোমালিয়া ইত্যাদি।

এই যুদ্ধে আমেরিকার নেতৃত্বে আছে নব্য রক্ষণশীল প্রোটেস্ট্যান্ট ঘরানার একটি দল, যাদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী বৃহৎ ইসরাইলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না হলে তাদের প্রতিশ্রুত 'মাসীহ' এর আগমন ঘটবে না। মার্কিন জনসাধারণের মাঝেও তাদের ব্যাপক সমর্থন রয়েছে। তাই এই যুদ্ধকে পশ্চিমের সংখ্যালঘু কোন গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে এমনও বলা যায় না। বরং পশ্চিমের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রত্যেকটি অঙ্গন খুব উদ্দীপনার সাথে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন অঙ্গন থেকে এই যুদ্ধে শামিল। খ্রিস্টান ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের মৌখিক ও কর্মভিত্তিক সমর্থন সুস্পষ্টভাবেই এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে রয়েছে ।

এখন মুসলিমদের একান্ত কর্তব্য হবে যে, উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে এর মোকাবেলায় নিজেদের সঠিক করণীয় নির্ধারণ করে নেওয়া। চাই এই যুদ্ধকে কাফেররা যতটা সুন্দর ও আকর্ষণীয় ভাষাতেই উপস্থাপন করুক না কেন। যেমন অধিকার রক্ষার যুদ্ধ, অধিকার আদায়ের যুদ্ধ, স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধ, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ইত্যাদি।

পারিভাষিক যুদ্ধ

ধর্ম ও যুদ্ধের এই পারস্পরিক সংশ্লিষ্টতা পশ্চিমা ধ্যান-ধারণায় এতটা গভীরভাবে প্রোথিত যে, এর সুস্পষ্ট উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় ওই পরিভাষাসমূহে, যা পশ্চিমারা এই যুদ্ধের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছে। এই যুদ্ধের ক্ষেত্রে ওরা যে সব শব্দ ব্যবহার করেছে, তা ক্রুসেডীয় সাহিত্যের একটি অংশ। যেমন- দুষ্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, ন্যায় প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ, ভালো ও খারাপের যুদ্ধ ইত্যাদি। এখানে দুষ্ট ও খারাপ দ্বারা মুসলিমদের বোঝানো হয়েছে।

আমরা এটাও জানি যে, পশ্চিমা ধ্যান-ধারণায় ধর্ম বলতে বোঝায় ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্টের সমন্বয়কে। এখানেই জায়নিস্ট ইহুদীবাদ ও জায়নিস্ট খৃষ্টবাদের জঘন্য ঐক্য। উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় যা আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। তখন একথাও বলা শুরু হয়েছিল যে, এই যুদ্ধ আর্মাগেডনের প্রস্তুতির এক সূচনালগ্ন। খ্রিস্টানদের মিথ ও বিশ্বাস অনুযায়ী আর্মাগেডন হলো ভবিষ্যতে সংগঠিত এক পবিত্র যুদ্ধ, যা মূর্তিপূজক ও খ্রিস্টানদের মাঝে সংঘটিত হবে। স্মর্তব্য যে, কেনানী অর্থাৎ মুসলিমরা খ্রিস্টানদের কাছে মূর্তিপূজক হিসেবে পরিচিত। আর্মাগেডন বিশ্বাসটা খ্রিস্টানদের ধ্যান-ধারণাকে অনেক গভীর থেকে প্রভাবিত করে।

এজন্য বুশ যখন 'ক্রুসেড' শব্দটি উল্লেখ করেছে, তখন না সে স্বপ্নের জগতে ছিল, আর না ভুলক্রমে এই শব্দ বলেছে। বরং আমেরিকানদের মন-মানসিকতায় লুকায়িত সত্য চিন্তাকেই সে প্রকাশ করেছে।

প্রেসিডেন্ট বুশের যেসব বিবৃতিতে একথা বোঝানো হয়েছে যে, সে ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় মনে করে, আসলে সেটা মুসলিমদের চোখে ধুলো দেয়ার জন্যই করা হয়েছে। এর এক উদ্দেশ্য তো এই যে, এই যুদ্ধের ব্যাপারে এই উম্মাহর সকল স্তরের মানুষ যেন অন্তর্দ্বন্দ্বে ভোগে এবং অধিকাংশ মানুষ যেন চুপটি মেরে তামাশা দেখতে থাকে।

দ্বিতীয়ত, এর মাধ্যমে কুফুরী শক্তির হাতের পুতুল মুরতাদ সরকারদের যেন এই কথিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সর্বান্তকরণে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার সুযোগ পাওয়া যায়। পশ্চিমা বিশ্ব খুব ভালো করেই জানে যে,

তাদের কুফুরী সভ্যতার সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো ইসলাম। আর মুজাহিদিন এই ইসলামের জন্য এক শক্তিশালী দুর্গ।

বাস্তবিকপক্ষে যখন আমেরিকা ও তার মিত্ররা এ কথা বলে যে, তারা মূলত: ইসলামের দুশমন নয়। সেক্ষেত্রে এই ইসলামের অর্থ হল উদারপন্থী আমেরিকান ইসলাম। আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন ইসলাম নয়। এই ইসলামকে মডারেট বলা হোক, কিংবা ইউরোপীয় এলাইটেনমেন্ট উদ্ভাবিত উদারপন্থী ইসলাম বলা হোক, বাস্তবে এটা হল বর্তমান যুগের দ্বীনে আকবরী। যে ধর্মে আমেরিকার দরবারে একবার কুর্নিশ ঠুকতে পারাই দাসত্বের মেরাজ হিসেবে পরিগণিত হয়। ইসলামে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য যে অবস্থান, এই ধর্মে সেই অবস্থানটাই আমেরিকাকে দেয়া হয়েছে। এখানে আমেরিকান শক্তিমত্তার সামনে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। বরং এই আত্মসমর্পণকে শরঈ পোশাকে সজ্জিত করতে পারাই সওয়াবের কাজ বলে মনে করা হয়।

যখন এর বিপরীতে যেই ইসলাম তাওহীদ ও কুফুর বিত তাগূতের দাওয়াত দেয়, যা ইহুদীদের অবৈধ উপস্থিতিকে ইসলামের ভূখন্ড থেকে অপসারিত করতে এবং ইসলামী দুনিয়ার অন্তর থেকে ইহুদী-নাসারাদের উচ্ছেদ করার দাওয়াত দেয় – তখন পুরো পশ্চিমা বিশ্ব স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘোষণা করে যে, এই ইসলামের সঙ্গে আমাদের সভ্যতার সংঘর্ষ অনিবার্য।

এদিকে এই পারিভাষিক যুদ্ধের শিকার ওই অসুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী মুসলমানরাও, যাদের ফতোয়া মার্কিন সেনাবাহিনীর কালিমাওয়ালা মুসলিম সদস্যদের কাফেরদের পক্ষ হয়ে অন্য মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণের মত কুফুরী কাজের ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা তো দেয়-ই না, বরং তাদেরকে সওয়াবের ভাগিদার সাব্যস্ত করতে চায়। (নাউযুবিল্লাহ)

কাতারের সরকারি মুফতী ইউসুফ কারযাভীর ঐতিহাসিক ফতোয়াটি লক্ষ্য করুন, যা তিনি আফগানিস্তানের উপর মার্কিন আগ্রাসনে শরিক হওয়া মুসলিম সেনা সদস্যদের ব্যাপারে দিয়েছিলেন—

“আমাদের জন্য ওই অপরাধের (অর্থাৎ ১১ সেপ্টেম্বরের মোবারক হামলার) মূল হোতাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছা অনেক জরুরী বিষয়। যারা এই অপরাধ সংগঠিত করতে উৎসাহ দিয়েছে, নিজেদের সম্পদ ব্যয় করেছে, কিংবা অন্য কোনোভাবে এই অপরাধে শরিক থেকেছে, তাদেরকে ইনসাফের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে যৌক্তিক সাজা দেয়া দরকার। তাদেরকে এমন উপযুক্ত শাস্তির আওতায় আনা দরকার, যা তাদের মত অন্যান্য যারা; এমন নিরাপরাধ মানুষের জান-মাল নিয়ে ছিনিমিনি খেলে এবং তাদের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে, তাদের সকলের জন্য দৃষ্টান্তমূলক হতে পারে।

সকল মুসলিমদের জন্য আবশ্যক যে, তারা সম্ভাব্য সকল পদ্ধতিতে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। মূলকথা এই যে, ইনশাআল্লাহ, এই বিষয়ে কোন সমস্যা নেই যে, মার্কিন ফৌজ এর অন্তর্ভুক্ত সকল মুসলিম সদস্য এমন সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে; যা সেই সকল লোকদের বিরুদ্ধে হবে, যারা সুস্পষ্টভাবে নিজেরা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিচালনা করেছে অথবা এমন লোকদের আশ্রয় দিয়েছে, অথবা তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং নিজেদের ভূমি তাদেরকে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে।

অবশ্য এই যুদ্ধে তাদেরকে সেই নিয়ত রাখতে হবে, যা আমরা উপরে বর্ণনা করেছি। মার্কিন ফৌজের মুসলিম সেনা সদস্যদের জন্য এটা এ জন্য জায়েজ, যেন দেশের প্রতি তাদের আনুগত্য সন্দেহের উর্ধ্বে থাকে।

উপরোক্ত ফতোয়ায় দস্তখত করেছেন ডক্টর ইউসুফ কারযাভী, ডক্টর মোহাম্মদ আল আউয়া, ফাহমী আল হুওয়াদী, ডক্টর হাইসাম আল খাইয়াত, এবং তারিক আল বিশরী। ২০০১ এর ২৭শে সেপ্টেম্বর প্রদত্ত এই

ফতোয়ার মূল ভাষা ইংরেজি, যা আরবি বিভিন্ন সংবাদপত্রে আফগানিস্তানের উপর মার্কিন আগ্রাসনের মাত্র একদিন পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল।

پاسبان مل گئے "کعبے سے" صنم خانے کو..... والعیاذ باللہ

"কাবার রক্ষক হয়ে গেল মন্দিরের পাহারাদার"! নাউযুবিল্লাহ।

চার্চ এই যুদ্ধে না অতীতে কখনো নিরপেক্ষ ছিল, না বর্তমানে নিরপেক্ষ আছে!

স্বৈরাচারী উপনিবেশের যুগে ইউরোপের খ্রিস্টবাদী চার্চগুলো আমেরিকা ও দূরপ্রাচ্য সব জায়গাতেই শাসকগোষ্ঠীর ডানহাত হিসেবে কাজ করেছে। তারা সেই সমস্ত অপরাধের ধর্মীয় বৈধতা প্রদান করেছে, যা ইউরোপীয় স্বৈরাচারী শাসকদের অপবিত্র হাতে সংগঠিত হয়েছে। মুসলিমদের হত্যা, ধর্ষণ, জ্বালাও-পোড়াও ও লুটতরাজকে আপন লক্ষ্যে পরিণতকারী প্রত্যেক স্বৈরাচারী ক্রুসেডার বাহিনীর ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতায় কোন না কোন চার্চের একজন প্রতিনিধি সক্রিয় ছিল। ঠিক যেভাবে ইভানজেলিক্স পাদ্রীরা মার্কিন সেনাবাহিনীর ইরাক ও আফগানিস্তান আগ্রাসনকে ধর্মীয় বৈধতা প্রদান করেছে, একইভাবে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চও এইসব স্বৈরাচারী আগ্রাসনের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে।

স্মর্তব্য যে, ইভানজেলিক্স হচ্ছে আমেরিকার ধর্মীয় দল। এই সেই গোষ্ঠী, যাদের পাদ্রীরা ওই সেনাদলসমূহের নেতৃত্বে ছিল, যারা আমেরিকার আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের জনবসতিগুলোতে আগ্রাসন চালিয়েছিল। যখন রেড ইন্ডিয়ান পুরুষদের জীবিত শরীর থেকে চামড়া খুলে ফেলা হচ্ছিল, যখন তাদের নারীদের গণহারে ধর্ষণ করা হচ্ছিলো, যখন তাদের শিশুদের আগুনে জীবন্ত দগ্ধ করা হচ্ছিল, তখন এই ইভানজেলিক্স পাদ্রীরা যিশুখ্রিস্টের নামে নজরানা দেয়ার বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান পালন করছিল এবং তাওরাত আবৃতি করছিল।

আজকে এই ইভানজেলিক্সদের উত্তরসূরীরাই ইরাক ও আফগানিস্তানে পূর্বসূরীদের ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করছে। মধ্যযুগে ক্রুসেডের ধ্যান-ধারণা বিনির্মাণ ও প্রচার প্রসারে কারিগরের ভূমিকা রেখেছিল এই চার্চ। যা সে সময়ে বায়তুল মাকদিস দখল করতে পারাকে স্বর্গের সার্টিফিকেট আখ্যায়িত করেছিল। আজ আবার সেই তারাই পশ্চিমা ক্রুসেডারদের এই বিশ্বাস নির্মাণের পেছনে কাজ করছে যে, এই যুদ্ধ আমেরিকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার যুদ্ধ। মানবতার মৌলিক অধিকার, স্বাধীনতা, সাম্য এবং প্রগতি ইত্যাদি আজ ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ, এজন্যই এসব পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে এই যুদ্ধে ঈশ্বর তাদের সঙ্গে আছেন।

পশ্চিমা বিশ্বের রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের মধ্যে এইসব চার্চের শিক্ষা-দীক্ষার গভীর প্রভাব বিদ্যমান। বরং সামাজিক অঙ্গনেও এর ব্যতিক্রম পাওয়া মুশকিল। ১৯৯১ এ মার্কিন জোট কর্তৃক উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় বৃটেনের অভিবাসী মুসলিমদের বসতিগুলোর দেয়াল দেয়ালে লিখে দেয়া হয়েছিল— **''ইরাকে নিহত এক একজন ব্রিটিশ সৈন্যের বদলে আমরা দুইজন মুসলিম শিশুকে হত্যা করব''।**

১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত পশ্চিমে অভিবাসনগ্রহণকারী মুসলিমদের যে কতটা সাম্প্রদায়িকতা, বৈষম্য ও সঙ্কীর্ণতার শিকার হতে হয়েছে, তা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। প্রায় পুরো পশ্চিমা বিশ্ব আজ ইসলাম ফোবিয়ার শিকার। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, কথিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে চলমান এই যুদ্ধে পুরো পশ্চিমা বিশ্বের রয়েছে নিঃশর্ত ও নিরঙ্কুশ সমর্থন।

জায়নবাদী খ্রিস্টবাদ

আমরা জানি যে, ইসলামের বিরুদ্ধে ইহুদীদের শত্রুতা সবচেয়ে জঘন্য। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَٰوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

"আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলমানদের অধিক শত্রু হিসেবে ইহুদী ও মুশরেকদেরকে পাবেন।" *[সূরা মায়িদাহ : ৮২]*

আমাদের পুরো ইতিহাসের ধারাবাহিকতা এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, ইসলামের বিরুদ্ধে ইহুদীদের ঘৃণা, বিদ্বেষ, ষড়যন্ত্র ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ সর্বদাই সবচেয়ে বেশি ছিল। নিজেদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে ইসলামের বৃক্ষকে উপড়ে ফেলার জঘন্য পাঁয়তারায় লিপ্ত হতে সবসময়ই তাদেরকে সবার আগে দেখা গেছে। পর্দার অন্তরালে দ্বীনে হকের বিরুদ্ধে ফেতনার আগুন প্রজ্জ্বলিত করতে তারাই সর্বদা সর্বাগ্রে ছিল। কিন্তু এই বাস্তবতাও অস্বীকার করার মতন নয় যে, তাদের সকল ধ্বংসাত্মক পাঁয়তারা ও ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনাসমূহকে কর্মে পরিণত করেছে খ্রিস্টানরা। অতএব, যদি ইহুদীদেরকে মু'মিনদের সবচেয়ে বড় শত্রু হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়, তবে খ্রিস্টানরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে সবচেয়ে অগ্রগামী থেকেছে। খ্রিস্টানদের সাথে আমাদের যুদ্ধসমূহের ইতিহাস একথা বলে যে, আমাদের সবচেয়ে বেশি যুদ্ধ হয়েছে তাদের সঙ্গে।

উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় কিছু মুসলিম ইতিহাসবিদের এই বিশ্লেষণমূলক সমীক্ষা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যে, বিগত চৌদ্দশত দশবছরে মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধসমূহের সংখ্যা সর্বমোট ৩৬০০।

মোটকথা, সংক্ষিপ্ত কিছু সময় ব্যতীত ইসলাম ও খ্রিস্টানদের মাঝে যুদ্ধ সর্বদা বিরাজমান ছিল। যেখানে ইহুদীদের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ নববী যুগের পর থেকে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের দখলদারিত্বের সময়ই মাত্র হয়েছে। কিন্তু খ্রিস্টানদের সাথে আমাদের যুদ্ধ আজ পর্যন্ত চলমান এবং হাদীসে নববীর ভাষ্য অনুযায়ী কেয়ামত পর্যন্ত এই যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে।

ফিলিস্তিনে ইহুদী রাজত্ব প্রতিষ্ঠা খ্রিস্টানদেরই একটি পরিকল্পনা ছিল। সম্ভবত এই বাস্তবতার ওপর চিন্তা-ভাবনা করলে আমরা খুব দ্রুতই খ্রিস্টানদের ব্যাপারে আমাদের সঠিক করণীয় উপলব্ধি করতে পারবো এবং বুঝতে পারবো যে, তারা আমাদের কথিত 'মাসীহি ভাই' নয়, বরং আমাদের প্রকাশ্য শত্রু। যারা নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতেই ইসলাম ও মুসলমানদেরকে নিজেদের প্রধান শত্রু মনে করে। ঐতিহাসিক বাস্তবতার ভিত্তিতে বলা যায়, এই খ্রিস্টানরাই ইসলামের বিরুদ্ধে ইহুদীদের প্রতিটি ষড়যন্ত্রকে বাস্তবে রূপ দান করেছে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ

"হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। *[সূরা মায়েদাহ : ৫১]*

অতএব, এটা আবশ্যক যে, ইহুদীদের ব্যাপারে আমাদের অত্যাধিক ঘৃণা যেন তাদের সঙ্গী খ্রিস্টানদের নাপাক ভূমিকার ব্যাপারে আমাদের চোখে পর্দা না ফেলে দেয় এবং তাদের ব্যাপারে আমাদেরকে গাফেল না করে। ক্রুসেডসমূহের মূল হোতা ছিল এ খ্রিস্টানরাই। ওরা সর্বদাই আমাদের শত্রু, আমাদের ব্যাপারে আক্রমণাত্মক। তাদের অতীত ইতিহাস এই বাস্তবতার সাক্ষী। ক্রুসেডের যুগ থেকে ঔপনিবেশিক যুগ পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস তো সবার সামনেই। এছাড়া বলকান, ইরাক, আফগান এর উপর তাদের আগ্রাসন খুব দূরের কোন বিষয় নয়।

আরব বিশ্বে ইসরাইলের নাপাক জন্মটাও ব্রিটিশ ক্রুসেডারদের হাতেই হয়েছে। আর তাদের অবৈধ দখলদারিত্বকে পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব মার্কিন ক্রুসেডাররা আপন কাঁধে তুলে নিয়েছে।

এছাড়া বর্তমান সময়ের বিকৃত খ্রিস্টবাদ একটি ইহুদী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে খ্রিস্টবাদের সিঁধ কেটে একে বিকৃত করার সূচনা অনেক আগেই হয়েছে। বর্তমানে খ্রিস্টবাদের যেই রূপ বহাল আছে, তা ইহুদীদের হাতে রোপিত চারাগাছ থেকে বেড়ে ওঠা সুবিশাল এক মহীরুহ বৈকি। খ্রিষ্টবাদকে বিকৃত করার তাদের এই ধারা সব সময় অব্যাহত থেকেছে। এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ার সর্বশেষ সফল রূপটির প্রকাশিত হয় ষোলো শতকের প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের আবির্ভাবের মাধ্যমে। ইহুদী ধর্মগ্রন্থ ওল্ড টেস্টামেন্টের সকল ভবিষ্যদ্বাণীকে সুনিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে এই গোষ্ঠী এবং তা বাস্তবায়িত করার জন্য সর্বদা সচেষ্টও। বর্তমান সময়ে তাদের প্রধান লক্ষ্যগুলো নিম্নরূপঃ

এক. নীল দরিয়া থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত বিস্তৃত জায়গায় বৃহত্তর ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং পৃথিবীর সকল ইহুদীদেরকে সেখানে নিয়ে আসা।

দুই. ভালোর বাহিনী (ইহুদী-খ্রিস্টান) ও মন্দের বাহিনীর (মুসলমান) মধ্যে আর্মাগেডন সংগঠিত করা এবং এর জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকা।

তিন. মসজিদুল আকসা ধ্বংস করে সেখানে হাইকালে সুলাইমানী নির্মাণ করা।

বৃটিশ-খৃষ্টানদের মাধ্যমে ইহুদী রাজত্ব প্রতিষ্ঠা মূলত: আর্মাগেডনের পথে যাত্রার একটি ধাপ মাত্র। এই জায়নবাদী ক্রুসেডারদের ঐক্যবদ্ধ পুনরুত্থানের আওয়াজ পরিষ্কারভাবে শোনা যাচ্ছে পশ্চিমা বিশ্বের আকাশে-বাতাসে। আমেরিকা ইহুদীদেরকে সার্বিকভাবে সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়ে যাবে এবং এর পেছনে যত মূল্যই দিতে হোক, তা সে প্রস্তুত করে রেখেছে। এই যুদ্ধ এখন দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা-চেতনার যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। আর এই যুদ্ধের মূল ফিল্ড হলো ইসলামী মধ্যপ্রাচ্য এবং মূল টার্গেট হলো বাইতুল মাকদিস।

সমকালীন ক্রুসেডে ইহুদী ও খ্রিস্টানরা যে পয়েন্টে এসে একতাবদ্ধ হয়েছে, তা হলো ইসলামকে শিকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলা। তাদের এই ঐক্য দৃষ্টিভঙ্গিগত, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। জায়নবাদি ইসরাইল রাষ্ট্রের এক সাবেক প্রেসিডেন্ট এ কথা বলেছিল যে, বর্তমান বিশ্ব নাকি ইসলামী মৌলবাদীদের পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় হুমকির শিকার এবং ইসরাইল এই ইসলামী জাগরণসমূহের মোকাবেলায় পশ্চিমা বিশ্বের স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণ করতে যুদ্ধ করছে।

মূলত: ক্রুসেডার পশ্চিমের জন্য ইসলাম একটি দেও-দানবে পরিণত হয়েছে। ওরা জানে ওদের সভ্যতা ও ব্যাপক বিস্তার প্রত্যাশী সাম্রাজ্যবাদী কর্মকাণ্ডের পথে সবচেয়ে বড় বাধা ইসলাম।

আমাদের করণীয়

এই পুরো পরিস্থিতি সামনে আসার পর এখন প্রশ্ন হলো এই মুহূর্তে আমাদের করণীয় কী? শুধু অবস্থার বিশ্লেষণ, ব্যাস এতোটুকুই? না, কক্ষনো না। বরং এই দুর্যোগময় অবস্থাকে পরিবর্তন করা আমাদের জন্য ফরজ। আজ মুসলিম উম্মাহ তার ইতিহাসের সবচেয়ে সংকটময় সময়টি অতিক্রম করছে। আমরা এই উম্মাহর অংশ। আমাদের কর্তব্য ও জিম্মাদারী হলো: দ্বীন ও মিল্লাতের বিরুদ্ধে এই সর্বব্যাপি আগ্রাসনের মোকাবেলা

করা এবং আপন জাতির ললাট থেকে অপমান ও লাঞ্ছনার এই কলঙ্কময় দাগকে মুছে ফেলার জন্যে সর্বশক্তি নিয়ে উঠে দাঁড়ানো। ফিলিস্তীন থেকে নিয়ে আফগানিস্থান পর্যন্ত দখলকৃত মুসলিমদের ভূমিগুলো ফিরিয়ে আনা। ইসলামী ইমারাহগুলোর প্রতিরক্ষা ও খিলাফাহ কায়েমের জন্য জিহাদের ঝান্ডা উত্তোলন করা। উম্মাহর প্রতিরক্ষায় প্রথম সারিতে দাঁড়ানো মুজাহিদীনের সাহায্য-সহযোগিতা করা, কেননা এটা আমাদের ও তাদের মাঝে যে ঈমানী বন্ধন রয়েছে তার প্রধানতম দাবি।

মোটকথা কোরআন ও সুন্নাহকে যারা সত্য দিলে নিজেদের আদর্শ হিসাবে মানে, তাদের পূর্ণাঙ্গভাবে কর্মের ময়দানে বেরিয়ে পড়া উচিত। যেন আমরা আসন্ন মোকাবেলার পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতঃ তিনটি মৌলিক বিষয়কে নিজেদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করতে পারি।

এক. কুফফারদের উচ্ছেদকল্পে মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করা।

পূর্ববর্তী ক্রুসেডাররাও নিজেদের হামলা, লুটতরাজ ও গণহত্যার প্রধান নিশানা বানিয়েছিল সাধারণ মুসলিমদের। তারা সাধারণ বেসামরিক মুসলিম ও মুজাহিদদের মধ্যে এমন কোন পার্থক্য করেনি যে, একজনকে পাকড়াও করেছে আর অন্য জনকে ছেড়ে দিয়েছে। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনকারী, রাত্রি জাগরনকরী, দুনিয়াবৈরাগী জাহেদ দরবেশরাও তাদের অস্ত্রের নিশানা থেকে রক্ষা পায়নি। আমাদের সমকালীন ক্রুসেডাররাও তাদের পূর্বপুরুষদের থেকে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নয়।

টাইমস্ ম্যাগাজিনের এক প্রবন্ধে একথা লিখা হয়েছিল যে, **"মুসলিমদের উদারপন্থী ও কট্টরপন্থীদের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। এরা সবাই মুসলিম।"***[১৬-৬-১৯৯২]*

এই দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় ধরনের মুসলিমই তাদের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বিবেচিত। দ্বীনি মাদ্রাসাসমূহ থেকে নিয়ে জিহাদি আন্দোলনসমূহ, ইসলামের শিরোনামে সবকিছুই তাদের চোখে কাঁটা হিসেবে বিধে। *[র‍্যান্ড কর্পোরেশন, Muslim world after ৯/১১]*

এ কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, আন্তর্জাতিক কুফরি শক্তি ঐ সকল জিনিসকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য পরিকল্পনাবদ্ধ, যার সাথে ন্যূনতমভাবে ইসলামের পূর্বাপর কোন না কোন সম্পর্ক আছে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

"বস্তুতঃ তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদিগকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব হয়।"*[সূরা বাকারাহ : ২১৭]*

এই দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিম উম্মাহর উপর দ্বীনের রক্ষণাবেক্ষণ ও বিজয়ের জন্য কীরূপ দায়িত্ব আরোপিত হয়, তা উপলব্ধি করা উচিত। মুসলিম উম্মাহর সকল আন্দোলনসমূহ আজ এই পরীক্ষার সম্মুখীন যে, তারা এই আগ্রাসনের সর্বব্যাপী চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় কী ধরনের জবাব দেবে, কিভাবে এর মোকাবেলা করবে। নিঃসন্দেহে এ কথা বলা অতিরঞ্জিত হবে না যে, মুসলিম উম্মাহর সামনে আজ সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের বিষয় এটাই। কেননা, মুসলিমদের দ্বীন ও দুনিয়াকে ধ্বংস করে দেয়া কুফফারদের; মুসলিম ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে দেয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজে আইন।

শহীদ শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. তাঁর الدفاع عن اراضي المسلمين اهم فروض الأعيان بعد الإيمان কিতাবে লিখেন যে, "পূর্ববর্তী পরবর্তী চার মাযহাবের সকল ফুকাহা, ওলামা, মুহাদ্দিসীন, মুফাসসিরীন,

ইসলামী ইতিহাসের সকল যুগে এই কথার উপর নিঃশর্তভাবে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, যদি কাফেররা মুসলিমদের কোন এলাকায় প্রবেশ করে, তাহলে সেই এলাকার ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বসবাসকারী সকল মুসলিমের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। এমতাবস্থায় সন্তান পিতা-মাতা থেকে, স্ত্রী স্বামী থেকে, ঋণগ্রহীতা ঋণদাতার থেকে অনুমতি নেয়া ছাড়াই যুদ্ধে গমন করতে হবে। যদি দুশমনকে প্রতিহত করবার জন্য এই সকল লোক যথেষ্ট সাব্যস্ত না হয়, কিংবা এই লোকেরা অলসতা করে বের না হয়, কিংবা উদাসীনতার সাথে কাজ করে, কিংবা বিনা অজুহাতে বসে থাকে, তাহলে এই ফরজে আইন বিধানটি কুফুরী আগ্রাসনের শিকার উক্ত অঞ্চলের সীমারেখার চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করবে। প্রথমে সবচেয়ে নিকটবর্তীদের নিজের আয়ত্বে নিয়ে আসবে, অতঃপর তাদের নিকটবর্তীদের। এরপর যদি এই সকল লোকেরাও যথেষ্ট না হয়, অলসতা করে, কিংবা আরো মুজাহিদের প্রয়োজন হয়, তাহলে ফারজিয়্যাতের এই বৃত্ত ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকবে, এমনকি প্রয়োজনের ভিত্তিতে পুরো পৃথিবীর উপর ছড়িয়ে পড়বে।"

এই গুরুত্বপূর্ণ ফরজ থেকে উদাসীন হয়ে আভ্যন্তরীণ ও শাখাগত বিষয়ে লিপ্ত থাকাকে বোকামি ছাড়া আর কী বলা যায়? যদি আজ দ্বীন ও মিল্লাতের কল্যাণকামীরাই না উঠে, তাহলে আর কে আছে এই আগ্রাসনের মোকাবেলায় উঠে দাঁড়াবে? অতএব আমরা দ্বীনী মাদ্রাসার তালিবুল ইলমদের থেকে নিয়ে সকল দ্বীনী আন্দোলনসমূহের একনিষ্ঠ কর্মীদের প্রতি সীমাহীন বিনয়ের সাথে এই দাওয়াত রাখছি যে, ইসলাম ও কুফরের এই প্রকাশ্য যুদ্ধে নিরপেক্ষতার ভূমিকা ত্যাগ করুন।

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

অর্থাৎ, **"সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর"**

এই কুরআনী নির্দেশনার উপর ভিত্তি করে অন্ততপক্ষে পুরো উম্মাহকে এক প্লাটফর্মে নিয়ে আসুন। কেননা دفع الصائل العدوّ অর্থাৎ আগ্রাসী শত্রুদের ইসলামের ভূমি থেকে বের করে দেয়া ফরজে আইন।

যদি কারো মুজাহিদীনের কোন বিষয় নিয়ে মতবিরোধ থাকে, তাহলে অন্তত আসলী (মৌলিক) কাফের ও আগ্রাসী শত্রুদের মোকাবেলায় যুদ্ধ করার জন্য ময়দানে নেমে আসুন। আমাদের আকাবিরদের পুরো ইলমী ভান্ডার এ কথার সাক্ষ্য বহন করে যে, এই পয়েন্টে এসে কারো কোন মতবিরোধ ছিল না। আগ্রাসী শত্রুদের বিরুদ্ধে এই জিহাদে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করার কি কি পদ্ধতি হতে পারে, সেই বিস্তারিত বিষয় এখানে আলোচনার সুযোগ নেই। তবে শুধু এতটুকু বলি যে, এই মুহূর্তে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজেকে নিজের এই প্রশ্ন করার সময় এসেছে যে, এখন এই অবস্থায় আমার ওপর শরীয়তের কী হুকুম? ঘরের কোণে বসে থাকা ব্যক্তিদের মত বসে থাকা, নাকি প্রথম কাতারে গিয়ে মুজাহিদিনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করা।

দুই. আন্তর্জাতিক জিহাদী আন্দোলনসমূহে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করা।

জিহাদি মানহাজ দিন দিন মাকবূলিয়্যাত ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করছে, আলহামদুলিল্লাহ। বর্তমান ইসলামী বিশ্বের অনেক স্থানেই সরাসরি জিহাদী মানহাজের ধারক-বাহক বিভিন্ন জামাত সংগঠিত হয়ে গেছে। যদিও ভৌগোলিক সীমারেখার ভিত্তিতে এই আন্দোলনগুলোর পারস্পরিক দূরত্ব অনেক বেশি, তথাপি চিন্তা-চেতনা ও কর্মপদ্ধতিগত দিক দিয়ে এরা সকলেই এক ও অভিন্ন। যার কারণে সাধারণ লোকেরা এদেরকে 'আল-কায়েদা, তালেবান' নামেই চিনে থাকে। এখানে আসলে নামটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না। আল্লাহর রাস্তায় হকের সাহায্যের জন্য, কিতাল ফি সাবিলিল্লাহর জন্য এবং তাগুতের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে যেই বের হবে, সেই আল্লাহর রহমতের ভাগিদার হবে, তায়েফায়ে মানসূরার অন্তর্ভুক্ত হবে, ইনশাআল্লাহ। এই তায়েফায়ে মানসূরার মধ্যে ফিকরী একতার সাথে সাথে যদি কর্মপদ্ধতিগত নৈকট্যও তৈরি হয়ে যায়, তাহলে

তো ‘নূরুন আলা নূর’ ই হবে।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক জিহাদী আন্দোলনসমূহ; তাদের সকল মনোযোগ ও লক্ষ্য ব্যয় করছে এ সময়ের সবচেয়ে বড় তাগুত আমেরিকাকে ধ্বংস করার জন্য। আমাদের উচিত, পৃথিবীব্যাপী আমরা সকলেই আমাদের নিজেদের অবস্থান ও অবস্থা অনুযায়ী এই আন্তর্জাতিক ঐক্যবদ্ধ কুফরি শক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করতে থাকি।

তিন. মুসলিম উম্মাহকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা।

ইসলাম তার অনুসারীদের পরাজিত থাকবার নয়, সর্বদা বিজয়ী থাকবার সবক শিখিয়েছে। আল্লাহর দ্বীন শরীয়তের বিজয় ও প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর কালিমাকে সুউচ্চ রাখার হুকুম প্রদান করেছে। সাথে সাথে ইসলামী ইমারাহ ও খিলাফাহ’র কর্ণধারদের নিকট এই নির্দেশনাও রেখেছে যে,

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে।”*[সূরা তাওবাহ : ২৯]*

পশ্চিমা বিশ্ব ভালোভাবেই এ কথা উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, যদি ইসলামী জাগরণের ধারা এভাবেই চলতে থাকে এবং জিহাদী আন্দোলনসমূহ এভাবেই সফলতা লাভ করতে থাকে, তাহলে পুরো পৃথিবীর মানচিত্রে ইসলামকে একটি বিজয়ী শক্তি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়ানো থেকে কেউ থামাতে পারবে না।

ইনশাআল্লাহ, এটা হবেও একদিন। বিশেষ করে যখন পশ্চিমা সভ্যতা বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ সমস্যা ও সংকটের কারণে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে।

এ কথাটি আজ থেকে বেশ কিছু সময় পূর্বে ফ্রান্সের পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক উচ্চপদস্থ অফিসার এভাবে ব্যক্ত করেছিলেন যে, **“ইসলামী বিশ্ব একটি কারাবদ্ধ দানব, যা এখনো নিজেকে নিজে চিনতে পারেনি। যেদিন এই দানব নিজের অজ্ঞতার বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, সেই দিনটা পশ্চিমা বিশ্বের জন্য এতটা ভয়াবহ প্রমাণিত হবে যে, এই দানব তাদের হাত থেকে পৃথিবীর নেতৃত্ব ছিনিয়ে নিয়ে তবেই থামবে।”**

ইসলামী বিশ্বের বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের সাংস্কৃতিক, সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গনসমূহে যত রকম ষড়যন্ত্র হয়েছে, তার পেছনে এই একটি ভীতিই লুকিয়ে আছে যে, কখনো এই জাতি যেন তাদের হারানো অবস্থান পুনরুদ্ধার করতে না পারে।

এজন্য পশ্চিমারা তাদের ষড়যন্ত্রকে বড় বড় আকর্ষণীয় শিরোনাম ও লোভনীয় পরিভাষার ছদ্মাবরণে লুকিয়ে রাখে, যেন সাধারন মুসলিমরা তার আসল চেহারা দেখতে না পারে। এই জিহাদকে চলমান রাখার জন্য এটা আবশ্যক যে, পুরো উম্মাহ তার চেষ্টা প্রচেষ্টাকে এর পেছনে ব্যয় করবো।

কিছু পরিসংখ্যান মতে, মুসলিমদের সমষ্টিগত জনবসতির সংখ্যা এক বিলিয়ন ত্রিশ কোটি এবং তা বাৎসরিক ২.২ হারে বেড়ে চলছে। পৃথিবীতে এটাই সবচেয়ে দ্রুত গতিতে বাড়ন্ত জনবসতি এবং এর মধ্যে ত্রিশ বছরের কম যুবকের সংখ্যা দুই তৃতীয়াংশ, যা অন্যান্য সকল দেশের সমষ্টিগত সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি। মুসলিম আধিক্যপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে এক বিলিয়নের চেয়ে বেশি মানুষ বসবাস করে, যেখানে মুসলিমদের সবচেয়ে বড়

সংখ্যা উপমহাদেশ তথা ভারত পাকিস্তান ও বাংলাদেশ তাদের সংখ্যা ন্যূনতম পঞ্চাশ কোটি। চীন-রাশিয়া ইউরোপে আনুমানিক দশ কোটি মুসলিমের বসবাস, যাদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি আছে চিনে। এত বড় একটি জাতির পক্ষ থেকে মাত্র কয়েক হাজার মানুষের জিহাদে অংশগ্রহণ কী অর্থ রাখে?

তাই এই যুদ্ধে বিজয়ের জন্য শর্ত হলো: উম্মাহর একটি বড় অংশকে এর পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব নিতে হবে। মোটকথা, উম্মাহকে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর মাধ্যমে দুনিয়ায় নেতৃত্ব হাতে তুলে নেয়ার জন্য জাগ্রত করতে হবে। শত্রুদের ছড়ানো প্রোপাগান্ডা ও সংশয়ের মুখোশ উন্মোচন করে তার সমুচিত জবাব দেয়ার জন্য এবং ভরপুর দাওয়াতি কাজের জন্য প্রচার মাধ্যমসমূহকে ব্যবহার করাটা এই ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

যদি আমরা জিহাদের পতাকা উত্তোলন করি, আমাদের কাতারসমূহের মধ্যে ঐক্যবদ্ধতা আনি এবং উম্মাহর সকল অংশ আমাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে, তাহলে এই যুদ্ধ আর ক্রুসেড থাকবে না, বরং ইতিহাস এটাকে ক্রুসেডের চূড়ান্ত পরাজয় হিসেবে স্মরণ করবে, ইনশাআল্লাহ।